OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 189 - 194
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

সংসার রঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৃণালিনী দেবীর পারিবারিক জীবন

রাজর্ষি চন্দ্র
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rajarshichunder@gnail.com
0009-0004-6019-6452

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Colonialism, Reform, Women, Progress, Sansar, Rabindranath Tagore, Mrinalini Debi.

Abstract

The nineteenth century in Bengal marked an important juncture in the history of India as far as women's question was concerned. Both the British rulers as well as Indian reformers took up the cause of women's improvement within the circles of society and family as a register of justification of colonial rule and reform efforts. The British claimed that it was them who were able to protect Indian women. This was because Indian men, particularly Bengali men were effeminate and quarrelsome without any manly prowess. On the other hand the Indian reformers, exclusively male, believed that real societal progress could be made if the condition of women be improved. In this the women themselves were absolutely passive as they lacked the ability to alter or improve their status.

Jorasanko Thakurbari, one of the most important cultural hubs of colonial Calcutta pioneered such reforms. The male members of the family often married uneducated young girls from villages of East Bengal and nurtured them later to turn them into sophisticated life companions. But there were instances even within the family of wives turning into sophisticated ladies with their own efforts. Or if we reconstruct this – the husband did not expect his wife to progress or change more than he had expected. I take up this question in the present essay by citing the example of Mrinalini Debi, wife of Rabindranath Tagore. She came as a child wife to Jorasako, an unsuspecting wife of a talented poet from a village in Jessore. She was not helped much by her husband in her studies and transformation. She was absolutely out of the mainstream reform project. Yet by her own efforts and tenacity she restructured herself into a mature and sophisticated woman.

In explaining this transformation, I attempt to underline the subjectivity of women within a colonial set up which both the British as well as the male reformers tried to suppress.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাঙালিকে যে প্রশ্নটি সবথেকে বেশি ভাবিয়েছিল তা হল নারী শিক্ষার ও নারী জীবনে বিভিন্ন কুসংস্কার থেকে মুক্তির উপায় নিরূপণ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজ সংস্কারক দুটো জিনিসে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথমটি হল নারীর সামাজিক উন্নতি না হলে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ঘটবে না। এবং দ্বিতীয়টি হল নারীদের উন্নতি একমাত্র পুরুষ সংস্কারকরাই নারীর অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম – সে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পারিবারিক মূল্যবোধ যাইহোক না কেনো। অপর পক্ষে ইংরেজরা মনে করতেন যে ভারতে ইংরেজ শাসকদের একটি নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং তা হল ভারতীয়দের উন্নতি ঘটানো। ইংরেজরা শুধুমাত্র লুট করে সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য ভারতে শাসন কায়েম করতে আসেনি। তাদের দায়িত্বর মধ্যে পড়ে যে তাঁরা ভারতীয়দের সভ্য করে তুলবেন। এই উন্নতির মূলে ছিল নারীর উন্নতি। ইংরেজরা বিশ্বাস করো যে প্রাক ঔপনিবেশিক যুগ থেকে ভারতীয় নারীরা কি সমাজের কাছে বা পারিবারিক দিক থেকে শোষিত হয়েছে। অবস্থার উন্নতি একমাত্র ইংরেজরাই করতে পারেন। ভারতীয় পুরুষরা বিশেষত বাঙালী পুরুষরা নারীসুলভ হওয়ার দরুন নারীদের সুরক্ষা বা উন্নতি কোনোটাই ঠিক মতো করতে পারেন না। কিন্তু এখানে দেখছি ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কেউই নারীদের স্বাধীন সত্তাকে স্বীকার করেননি। এও তাঁরা মানতে রাজি ছিলেন না যে নারীরা তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন না সেটি পরিবর্তন করতে পারগ বা আগ্রহী। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয় বা বলা যেতে পারে অতি সরলীকৃত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে এমন অনেক উদাহরণ মিলবে যেখানে মেয়েরা চিরাচরিত সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ না নিয়ে এমনকি আগ্রহী না হয়েও নিজেদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ও তাকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন। এর জন্য পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের হয়নি।[১]

এই প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এবং বিশেষ করে সেই পরিবারের বধূ রবীন্দ্র–পত্নী মৃণালিনী দেবী। তাঁর সম্পর্কে এই প্রবন্ধে আলোচনা করব। খ্যাতিমান স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হওয়া ছাড়াও তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি আলাদা জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং তা করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ঊনবিংশ শতকের কলকাতা তথা বাংলায় এক অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তদীয় সন্তানগণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই রাজনীতি, সমাজ সংস্কার ও সংস্কৃতির জগতে নিজেদের সাক্ষর রেখে গেছেন। নারী শিক্ষার প্রতি এঁদের সকলেরই উৎসাহ ছিল। জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানোদানন্দিনী দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে অন্দরমহলে বৈষ্ণবীদের যাতায়াত ছিল। তাঁরা যে শুধু গান শুনিয়ে ভিক্ষা করতে আসত তা নয়, তাঁরা অন্দরমহলের ভিতরে প্রবেশ করে সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতো ও তাদের বাংলা, প্রাথমিক সংস্কৃত ও প্রাথমিক গণিত শিক্ষা দিত। অক্ষর পরিচয় হলে অন্দরমহলবাসিনীরা নিজেরাই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ পড়তে পারত। বাইরের বাজার থেকে পুস্তক সংগ্রহ করে অন্দরমহলে আনা হত ও যে পড়তে পারে এমন কোনো সদস্য তা অন্যদের পড়ে শোনাতো। যারা অন্য কোনো বই পড়ার সুযোগ পেতো না তাঁরা শব্দকোষ পড়ে সময় কাটাতো। মোটকথা পরিবারের নারী সদস্যদের মধ্যে পড়াশোনা করার এক অদম্য উৎসাহ ছিল।[২]

পরিবারের পুরুষদের নারীশিক্ষা নিয়ে বাস্তব গবেষণা করার আর একটি ক্ষেত্র ছিল তাঁদের বিবাহিত স্ত্রী। যেহেতু জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার ছিল নিম্ন শ্রেণির পিরালি ব্রাহ্মণ, যাঁদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা মেলামেশা বা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে চাইত না[৩], সেই কারণে জোড়াসাঁকোর পুত্র বধূরা প্রায় সকলেই আসত পূর্ববঙ্গের যশোরের পিরালী পরিবার থেকে। তাদের বিবাহ হত অতি অল্পবয়সে এবং শ্বশুর বাড়ি এসে তাদের শিক্ষার ভার নিতেন তাঁদের স্বামীরা।[৪] সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পত্নী জ্ঞানোদানন্দিনীর শিক্ষার ভার অর্পণ করেন তাঁর ভাই হেমেন্দ্রনাথের ওপর। জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে তাঁকে ইংরিজি, বাংলা, অঙ্ক, প্রাথমিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পড়তে হত এবং তা পড়তে হত একেবারে রুটিন অনুযায়ী। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে ICS পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে চিঠি তাঁর স্ত্রীকে লিখতেন সেগুলিতে স্ত্রীর পড়াশোনার উন্নতির বিষয়ে নিয়মিত খোঁজ রাখতেন ও তাঁর স্বাথ সম্পর্কেও নানা উপদেশ দিতেন। ভারতে ফেরার পর

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনি বোম্বাই প্রদেশের আহমেদাবাদ শহরে সরকারি চাকরি নেন। পরিবারের অমতে তিনি স্ত্রীকে নিজের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যান। যখন জ্ঞানোদানন্দিনী বোম্বাই থেকে কলকাতা ফিরলেন তখন তাঁর পরিবর্তন দেখে পরিবারের লোক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা বিরক্তও হয়েছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী বোম্বাই থেকে এনেছিলেন এক নতুন শাড়ি পরার পদ্ধতি যা নারীদের শরীর পুরোপুরি ঢেকে লজ্জা নিবারণ করতে সাহায্য করত। এই পদ্ধতিই এখন সারা ভারতে প্রচলিত। কলকাতায় এসে জ্ঞানদানন্দিনীর সামাজিক জীবন শুরু হল। সাহিত্য সভা থেকে ছোট লাটের চায়ের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত সকল জায়গায় তাঁর ছিল অবাধ গতি। এই ব্যাপারে পরিবারের আপত্তি বা অসন্তোষ তিনি গ্রাহ্য করতেন না। গ্রাম্য বালিকা থেকে সংস্কৃতিবান শিক্ষিত রমণিতে এই রূপান্তর সত্যিই বিস্ময়কর।

মৃণালিনী দেবীর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। রবীন্দ্র পত্নী মৃণালিনী সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় স্বামীর পরিবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ যখন হয়েছিল তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। আর রবীন্দ্রনাথের তেইশ। বিবাহ হয় ১৮৮৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর। এর কিছু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন (১৮৭৮)। যেহেতু বাড়িতে তাঁর পড়াশোনা হচ্ছিল না এবং কোনো স্কুলেই তিনি মন বসাতে পারছিলেন না, অভিভাবকরা ঠিক করেছিলেন যে তাঁকে যদি বিলেত থেকে ব্যারিস্টার করে নিয়ে আসা যায় তবে তাঁর উপার্জনের একটি পথ খুলবে এবং হয়তো তাঁর সমাজ জীবন ও খানিক প্রসারিত হবে। বিলেত যাওয়ার প্রথম পর্যায়ে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই এর বাড়িতে থেকে ও পরে অন্নপূর্ণা তড়খড় নামে এক মারাঠি মেয়ের বাড়িতে থেকে তিনি ইংরেজি আদব কায়েদা শিখছিলেন। ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা তাঁকে ভালোবেসে ফেলেন ও সে কথা তাঁকে বলেন। রবীন্দ্রনাথ অন্নপূর্ণার ইচ্ছাকে মর্যাদা দেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ইংল্যান্ড পৌঁছে সেখানকার সমাজে মেয়েদের সম্মান ও মর্যাদা দেখে আশ্চর্য হন ও বাংলার নারীদের শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দুঃখিত হন। তাঁর মনের ভাব এবং চিন্তা তিনি পত্রের আকারে তাঁর নতুন বৌঠান, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবীকে লিখে জানাতেন। এই চিঠিগুলি পরবর্তী কালে ইউরোপে প্রবাসীর পত্র রূপে সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু এই চিঠিগুলি পড়ে ও অন্নপূর্ণা তড়খড় এর বিষয়টি কর্ণ গোচর হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে দ্রুত ইংল্যান্ড থেকে ফিরতে বলেন এবং ফিরে আসার পর দ্রুত তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন।[৫]

পাত্রীর নাম ভবতারিণী। বয়স ১০ বছর। পিতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মুহুরীর কাজ করেন। নিবাস যশোরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। কন্যার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিছুই নেই। বোঝাই যাচ্ছে কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের পুত্রবধূ হওয়ার মতো কোনো গুণই পাত্রীর মধ্যে ছিল না। তবু যে এই মেয়েটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হল তার কারণ পারিবারিক দুশ্চিন্তা। হয়তো রবিকে সাংসারিক করে তোলার এক সরল প্রচেষ্টা।[৬]

পাত্রীর পরিবারের দারিদ্র্যের কথা ভেবে ঠিক হল বিবাহের অনুষ্ঠান জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হবে। সেই অনুযায়ী পাত্রীর আত্মীয়রা কলকাতায় এক ভাড়া বাড়িতে স্থিত হল। বিবাহ সম্পন্ন হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথকে শুধু এক মহল থেকে অপর মহলে আসতে হল বিবাহ করতে। কিন্তু স্বামীর ঘরে বিবাহের এই অনুষ্ঠান পাত্রী এবং তার পরিবারের ওপর কি প্রভাব ফেলেছিল, তারা প্রস্তাবটি মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিল কিনা তার কোনো হদিস আমরা পাইনা।[৭]

বিবাহের অনতিকাল পরেই ভবতারিণীর নাম বদলে হয়ে গেল মৃণালিনী। বদল ঘটালেন তাঁর স্বামী। মৃণালিনী নামটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। এখানে বলা দরকার যে আনা তরখর এর নাম ও রবীন্দ্রনাথ রেখেছিলেন নলিনী, যা মৃণালিনীর সমার্থক। হতে পারে ভবতারিণী নামটি কালীর অপর নাম। এই নামে এক কালীমন্দির আছে এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কালীপূজা বিরোধী, অনুষ্ঠানের অন্তর্গত বলিদান প্রথাকে তিনি মনে করতেন অমানবিক এবং নারকীয়। তাঁর বিসর্জন নাটকে এর প্রমাণ আছে। তাই হয়তো ভবতারিণী নামটি তাঁকে বিব্রত করেছিল। তাই এই পরিবর্তন। অথচ এই ব্যাপারে ভবতারিণীর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি তাঁর স্বামী। পিতৃদত্ত নাম হারিয়ে এক নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

মৃণালিনী তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যে জীবন শুরু করলেন তা একাধারে ছিল একাকী ও জটিল। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা ভুলতে পারতেন না বা ভুলতে দিতেন না তাঁদের সঙ্গে নব বধূর সমাজিক পার্থক্য। পরিবারের উপযুক্ত করে তোলার জন্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মৃণালিনীকে ভর্তি করে দেওয়া হল লোরেটো স্কুলে। উদ্দেশ্য নববধূকে আদব কায়দায় পারদর্শী করে তোলা। কিছুটা হলেও শহুরে করে তোলা। একথা উল্লেখ্য যে লরেটো স্কুলে এর আগেই ভর্তি হয়েছিলেন জ্ঞানোদনন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরা দেবী। এবার জ্ঞানদানন্দিনি দেবীর ইচ্ছা অনুসারে মৃণালিনীকেও ভর্তি হতে হল একই স্কুলে।[৮] এর জন্য মৃণালিনীকে থাকতে হল বিরজিতলাও এ জ্ঞানোদনন্দিনীর নবনির্মিত বাড়িতে; স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন মৃণালিনীর উন্নতি করতে একমাত্র ইংল্যান্ড ফেরত জ্ঞানোদানন্দিনিই পারবেন। এখানেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার ব্যাপারে মৃণালিনীর কোনো মতামত নেওয়া হয়নি। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে শিক্ষা নিয়ে এত কিছু ভেবেছেন, বাস্তবে সেই ভাবনার রূপ দিয়েছেন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন তিনি নিজের স্ত্রীর শিক্ষার ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেননি, বরং অন্যের নির্দেশ নিঃশব্দে মেনে নিয়েছেন। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী ও দুই নাবালক সন্তান বিলেত গিয়েছিলেন এবং তাও একা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিবাহের পর যখন প্রথম বিলেত গেলেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে হতে বলেননি। বরং স্ত্রীকে অন্দরমহলে রাখার নীতিকেই মেনে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপার নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করেননি।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রথম পর্যায়ে, মোটামুটি, ১৮৮৩ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত নবদম্পতির মধ্যে কোনো চিঠির আদানপ্রদানের কথা জানা যায় না। তিনি হয়তো সেই সময় আদিব্রাহ্ম সমাজের সচিবের দায়িত্ব পালন করতে ব্যস্ত ছিলেন। হয়তো পুরাতনপন্থী ও নব্য হিন্দুদের যেমন চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখের সঙ্গে লেখনিযুদ্ধ করতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জন সময় কাটানোর সময় স্বল্প থাকত হাতে। হয়তো বা মৃণালিনীও স্বামীর চিঠির উত্তর দিতে ঠিক ততটা পারদর্শী হয়ে ওঠেননি। মোটকথা রবীন্দ্র মৃণালিনীর যে স্বল্প সংখ্যক চিঠি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার বেশিরভাগ ১৮৯০'র দশকে লেখা। এখান থেকে যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ছিল না তবে সেটা পরিস্থিতির অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে। তাঁদের প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্য হয় ১৮৮৬ এর ডিসেম্বর মাসে। বিয়ের তখনও দু-বছরও পূর্ণ হয়নি।

দাম্পত্য প্রেম ফুলের মতো ফুটে উঠেছিল গাজীপুরে ছুটি কাটাতে গিয়ে। উত্তর ভারত চিরকালই রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল রোমান্সের আদিভূমি। তাই যৌবনে মনে হয়েছিল মোগল শাসনের অন্যতম কেন্দ্র গাজীপুরে এখনও মোগল রোমান্সের অবশিষ্ট খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে বিষয়ে হতাশ হলেও তাঁদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের উন্মেষের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই ভ্রমণ ও প্রবাস বাস মৃণালিনীর কাছে প্রথম বার জোড়াসাঁকোর বৃহৎ পরিবারের থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ। তাঁরা দুজনে একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে ১৮৮৮ সালে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান রথীন্দ্রনাথের জন্য হয়।[৯]

পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে বাইরে বেরোনোর আর একটি সুযোগ মৃণালিনী পেয়েছিলেন ১৮৮৯ সালে। ওই বছর তিনি তাঁর স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে শিলাইদহে থাকতে গেলেন। তাঁরা থাকতেন পদ্মা নদীর ওপর নৌকার ভিতর। স্বামী সঙ্গ আরও বেশি ঘনিষ্ঠতা নিয়ে এলো দু-জনের মধ্যে। একদিন যখন মৃণালিনী পদ্মার চরে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে হারিয়ে গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা ও স্বয়ং লণ্ঠন হাতে স্ত্রীকে খুঁজতে বেরোনো দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

পত্নীর থেকে আলাদা কষ্ট রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন ১৮৯০র অক্টোবরে যখন তিনি মেহদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে ইংল্যান্ডে গেলেন ছয় মাসের ছুটি কাটাতে। প্রবাসে ঘন ঘন বাড়ির কথা ও পরিবারের কথা মনে পড়ত। এমনকি একবার জাহাজে অসুস্থ অবস্থায় তিনি মৃণালিনীকে স্বপ্নে পর্যন্ত দর্শন করেছিলেন।[১০] স্ত্রী ও পরিবারের কথা খুব মনে পড়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রবাস বাসের সবটুকু রস শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। অতএব এক মাসের মধ্যে বিলেত থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। সেটি হল রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদার মতো স্ত্রীকে বিলেত নিয়ে যাওয়ার মতো সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি। তিনি হয়তো তাঁর পিতার বিরক্তি উদ্রেক করতে চাইছিলেন না। সত্যেন্দ্রনাথের মতো স্বাধীন উপার্জনও তখন তাঁর ছিল না তাই তিনি এই অস্বস্তিকর প্রস্তাব তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথকে দেননি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকতে শুরু করেন। এখান থেকেই তিনি আপন জমিদারি পরিদর্শন করতে বেরোতেন। এর সঙ্গে সন্তানদের পড়ানোর ভারও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে অজস্র চিঠি লিখতে শুরু করেন যা পরবর্তীকালে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে সংকলিত হয়। তিনি যেন ইন্দিরা দেবীর মধ্যে তাঁর সাহিত্যের সঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছিলেন যাঁর সঙ্গে তিনি ভাগ করে নিতে পারতেন তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি যার প্রকাশ হত সাহিত্যে।

মৃণালিনী দেবী তাঁর জীবন সঙ্গিনী হলেও সাহিত্যের সঙ্গী তিনি কখনোই হননি তাঁর স্বামীর। কথিত আছে যে সদ্য বিবাহ হওয়ার পর তাঁর স্বামী নাকি একটি সদ্য রচিত কবিতা তাঁকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তা শুনতে শুনতে মৃণালিনী ঘুমিয়ে পড়েন। কবি স্বামীর ধারণা হয় যে তাঁর স্ত্রীর সাহিত্য বোধ নেই। অতএব কাদম্বরী দেবীর পর সাহিত্যের সঙ্গী ইন্দিরা দেবী।

ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রগুলি পরবর্তী কালে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। শিলাইদহ বাসকালে একটি ঝড়ের অভিজ্ঞতার বর্ণনা মৃণালিনী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ দেন একেবারে ঘরোয়া কেজো ভাষায়। ঠিক যেমন একজন নাবালিকাকে তার গুরুজন একটি ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। কিন্তু ওই একই ঘটনার কথা ইন্দিরা দেবীকে বর্ণনা করা হয়েছে কাব্যিক ভাষায়।[১১] এখান থেকে একটি বিষয় স্পস্ট যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে নাবালিকা ও শিশুসুলভ বলে মনে করতেন যাকে গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখা যায়।

এতদ সত্ত্বেও মৃণালিনী দেবী নিজেই নিজের জন্য সংসারে একটি বিশিষ্ট জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। পড়াশোনায় স্বামীর প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলেও তিনি স্বয়ং বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। বই জোগাড় করে দিয়ে এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করতেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৃণালিনী পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তাঁর মা বলেন্দ্রনাথের কাছে পড়াশোনা করতে ভালবাসতেন। ক্রমে নিজের চেষ্টায় সংস্কৃত শিখে রামায়ণ ও মহাভারতের বেশ কিছু অংশ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।[১২] কিন্তু দুঃখের বিষয় মৃণালিনী দেবীর অন্য সব লেখার মতোই অনুবাদগুলিও হারিয়ে গেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সঙ্গী ছিলেন কাদম্বরী দেবী ও ইন্দিরা দেবী ঠিক সেরকমই মৃণালিনী নিশ্চিন্ত বোধ করতেন বলেন্দ্রনাথের সানিধ্যে। বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু মৃণালিনীর জীবনে এক বিষাদের ছায়া নিয়ে আসে যা শেষপর্যন্ত মৃণালিনীর বেঁচে থাকার অবলম্বনকে শিথিল করে দেয়।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাস্রম তৈরি করেন (১৯০১) তাঁর আদর্শ শিক্ষার প্রসার করতে তখন মৃণালিনী দেবী এক সম্যক ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজের থেকে তাঁর গহনা আশ্রম তৈরি করতে স্বামীর হাতে তুলে দেন। গহনা বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে টাকার জোগাড় করে সেই টাকায় আশ্রমের কাজ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে এই বিদ্যালয় থেকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে ছাত্ররা যারা পড়াশোনা করে বেরোবে তারা সমাজে আদর্শ পুরুষ রূপে আবির্ভূত হবে। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাদের মধ্যে সেই শক্তি জাগিয়ে তুলবে যা প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটাবে। এই বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে তাঁর নিজের দুই সন্তান, রথীন্দ্রনাথ ও শমিন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করছিলেন। তাদেরকে অন্যান্য ছাত্রদের মতো কঠোর আশ্রমিক জীবনযাপন করতে হত। মাঠিতে শোয়া, তোষক বালিশ চাদর ব্যবহার না করা, ঠান্ডা জলে স্নান, পায়ে জুতো না পরা এবং কঠোর নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস এই কঠোরতার অঙ্গ ছিল।[১৪] কিন্তু মৃণালিনী দেবীর এত কঠোরতা পছন্দ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝেই আশ্রমের সমস্ত ছাত্রদের ডেকে নিজের হাতে রান্না করে তাদের খাওয়াতেন। রান্নায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এক ভক্ত হেমলতা দেবী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে মৃণালিনীর রন্ধিত খবর রবীন্দ্রনাথের বন্ধু মহলেও খুব জনপ্রিয় ছিল এবং সকলেই তার খুব প্রশংসা করতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন বহু সময় এমন হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীকে নতুন নতুন রান্নার নির্দেশ দিয়েছেন যা আপাতত দৃষ্টিতে অদ্ভুত এবং যা চিরাচরিত রন্ধন পুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু মৃণালিনী সেই সব রান্না করে স্বামীর কথা রেখেছেন। এই ভাবে স্বামীর এবং স্ত্রীর মধ্যে একধরনের রোমান্টিক ঘনিষ্ঠতা ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু সেটি ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 21
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 189 - 194
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর দুই কন্যার বিবাহ হয় যায়। এই বিবাহগুলি খুবই দ্রুত ঘটে। এতে মৃণালিনী দেবীর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই ঘটনা দুটি তাঁকে আরই হতাশ করে এবং তার সাথ যোগ হয় অপ্রতিরোধ্য গর্ভধারণ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীকার করেন যে ১৯০১ থেকেই মৃণালিনী যে অসুস্থ হয়ে পড়েন তার অন্যতম প্রধান কারণ শুষ্ক সূতিকা – একটি গর্ভ ধারণ জনিত রোগ। যদিও বিচক্ষণ চিকিৎসক দেখানো যেত কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিকভাবে স্ত্রীর চিকিৎসা নিজের হাতে রাখেন। হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসা হয় ও জোড়াসাঁকোর লাগোয়া লাল বাড়িতে রাখা হয়। এই বাড়িটি পরবর্তীকালে বিচিত্রা ভবন নামে এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

মৃত্যু শয্যায় মৃণালিনী ছিলেন একা। মধুরীলতা, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন শ্বশুরবাড়ি বিহারের মুজাফফরপুরে। শমিন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তিনিকেতনে। রেণুকা হয়তো জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই ছিলেন কিন্তু তিনি নিজেই তখন যক্ষা আক্রান্ত। এমনকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বার বার করে বাড়ির বাইরে, বন্ধুদের সান্নিধ্যে থাকতেন। মৃত্যুশয্যায় মৃণালিনী শমীন্দ্রকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্তানের শ্রেয় বোধে সেই ইচ্ছা পূরণ করেননি। রথীন্দ্রনাথ যখন তাঁর মাকে শেষ দেখা দেখলেন তখন মৃণালিনীর বাকরুদ্ধ। শুধু মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের চোখের জলের স্মৃতিটুকু রথীন্দ্রনাথ বহন করে নিয়ে গেলেন। মৃণালিনী দেবী ২৯ নভেম্বর ১৯০২ পরলোকগমন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেম গড়ে ওঠার পথে হঠাৎ করে সব শেষ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের শোকের প্রকাশ দেখা গেল স্মরণ নামক কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। সেখানে শোককে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখার চেষ্টা আছে। তবু মৃণালিনীর যে ভাবটি কবিতাগুলিতে ফুটে উঠেছে তা তার স্বামী সেবা ও আত্মত্যাগের ভাবটি।

একটি নগণ্য গ্রামের অশিক্ষিত বালিকা বধূ থেকে এক লোকপ্রিয় বধূ হয়ে ওঠার কাহিনী হল মৃণালিনী দেবীর জীবন। এক বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের চেষ্টায় ও গুণে এই জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন। চিরাচরিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থেকেও ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন, স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ না রেখেও নারী রূপে আত্মপ্রকাশ করার উজ্জ্বল উদাহরণ হলেন মৃণালিনী দেবী, যিনি নিঃসন্দেহে শুধু মাত্র তাঁর স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে পেরেছিলেন।

Reference:

১. Sarkar, Tanika, Hindu Wife, Hindu Nation, Permanent Black, New Delhi, 2001, pp. 191-225
২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার, প্রদীপ, পৃ. ৩১৪-৩১৬
৩. Andrew Robinson and Krishna Dutta, Rabindranath Tagore:The myriad minded man, Rupa, New Delhi, 2005, p. 52
৪. দেবী, জ্ঞানোদানন্দিনী, পুরাতনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৩
৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১৪
৬. চট্টোপাধ্যায়, পূর্নানন্দ, কবি পত্নী মৃণালিনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ০৩
৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবন কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৬
৮. চট্টোপাধ্যায়, পূর্নানন্দ, উপরিউক্ত ২০০৮, পৃ. ৪২
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মানসী (১৮৯১), ভূমিকা, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০০৮
১০. রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র, ১৮৯০, চিঠিপত্র (খণ্ড ১), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৩
১১. রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র, ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২১, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৫-৪৭
১২. চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণানন্দ, কবি পত্নী মৃণালিনী, উপরিউক্ত, পৃ. ৩৩
১৩. তদেব, পৃ. ৩৪
১৪. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবন কথা, উপরিউক্ত, পৃ. ২৯